Southeast University Journal of Arts and Social Sciences, Vol. 3, Issue 2, December 2020

আফ্রিকার ছোটগল্প: ঔপনিবেশিক ভূ-রাজনীতি ও বর্ণবাদ

সাদিয়া আফরিন[১]

African Short Stories: Colonial Geopolitics and Racism

Sadia Afrin

সারসংক্ষেপ

আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয়ে থাকে কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই এই মহাদেশ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঋদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপিয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই মহাদেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বর্বর বলে চিহ্নিত করা হলেও এর ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের ছোবলে আফ্রিকা মহাদেশ রক্তাক্ত হয়েছে বারংবার। আফ্রিকার ভূ-রাজনীতি, ইতিহাস, ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশায়নের কালো ছায়া। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনে আফ্রিকা মহাদেশ হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। পৃথিবীর অনেক দেশই উপনিবেশায়নের শিকার হয়েছে তবে আফ্রিকার মানুষেরা ছিলো সবচেয়ে বেশি শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও অত্যাচারিত। তারা একে একে হারিয়েছিল তাদের সকল মৌলিক ও মানবিক অধিকার। ভয়ংকর বর্ণবাদের শিকার হয়েছে সমগ্র আফ্রিকার জনগণ। কালো চামড়ার কারণে লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানকে দাসে পরিণত করা হয়েছে। এই সকল অত্যাচার, নিপীড়নের মধ্যেও বেগমান ছিলো আফ্রিকার সাহিত্য। আফ্রিকার মানুষের উপর ঘটে যাওয়া সামগ্রিক শোষণ, বঞ্চনার ও তাদের প্রতিরোধের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে তাদের লিখিত সাহিত্যের মাধ্যমে। বিশেষভাবে বলা যায়, আফ্রিকার ছোটগল্পগুলো আফ্রিকার ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও নিষ্ঠুর বর্ণবাদের প্রামাণ্য দলিল। এই প্রবন্ধে আফ্রিকার ছোটগল্পে বর্ণিত আফ্রিকা মহাদেশের ভূ-রাজনীতি ও বর্ণবাদের বর্বর চিত্রের উপর আলোকপাত করা হলো।

মূলশব্দ: আফ্রিকা মহাদেশ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, আধিপত্যবাদ, আফ্রিকার ছোটগল্প

Abstract

Africa is known as the dark continent but the geographical, political, and cultural history of this continent is very rich. Although the continent is described as barbaric from a European point of view, its history is very ancient and its cultural excellence is profound. The African continent has been repeatedly bloodied by colonialism. Imperialist colonization has a profound effect on the geopolitics, history, culture, language, and literature of Africa. Different countries of Europe formed colonies all over the world but the people of Africa were the most oppressed, exploited, and deprived. They lost land rights in their own country. Millions of Africans became slaves because of being black. The racism of colonialism spread throughout Africa. In the midst of all this oppression and persecution, African literature continues to flourish. African literature written during the colonial or post-colonial period reveals the history of the total exploitation and deprivation of the African people and their resistance. African short stories in particular are evidence of Africa's geopolitical history, cultural hegemony, and brutal racism. The following article sheds light on this continent's colonial geopolitics, and the brutality of racism through short stories of African literature.

Keywords: African continent, colonialism, racism, hegemony, short stories of Africa

[১] প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
E-mail: sadia.afrin@seu.edu.bd

আফ্রিকার কোনো ইতিহাস নেই, এ প্রস্তাব যেমন অগ্রহণীয়; তেমনি আফ্রিকা মহাদেশ একটি অখণ্ড দেশ, আফ্রিকানরা একটি অখণ্ড জাতি এ ধারণাও বাস্তব সত্যের দ্বারা অসমর্থিত (শিবনারায়ণ রায়, ২০০২; ১৩)। পৃথিবীর মানচিত্রে অন্যতম সমৃদ্ধ মহাদেশ হিসেবে খ্যাত আফ্রিকা। আদিম যুগে পৃথিবীর যে কয়েকটি স্থানে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো আফ্রিকা তার অন্যতম। আফ্রিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলে পরিচিত। কিন্তু এই মহাদেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইউরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মহাদেশকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করা হলেও এর ইতিহাস অনেক সুপ্রাচীন এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা সুগভীর। আফ্রিকার ভূ-রাজনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের উপর পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশায়নের গভীর প্রভাব। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু আফ্রিকার মানুষেরা ছিলো সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত, শোষিত ও বঞ্চিত। নিজেদের দেশে তারা হারিয়েছিলো ভূমির অধিকার। কেবলমাত্র কালো চামড়ার কারণে লক্ষ লক্ষ আফ্রিকার অধিবাসী পরিণত হয়েছিলো দাসে। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীর বর্ণবাদ জর্জরিত করেছিলো সমগ্র আফ্রিকাকে। এই অত্যাচারের ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও আফ্রিকার সাহিত্য ছিলো বেগবান। উপনিবেশায়ন ও উত্তর-উপনিবেশায়নের কালে লিখিত আফ্রিকার সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে আফ্রিকার মানুষের ওপর ঘটে যাওয়া সামগ্রিক শোষণ, বঞ্চনা ও তাদের প্রতিরোধের ইতিহাস। বিশেষভাবে আফ্রিকার ছোটগল্পগুলো আফ্রিকার ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস,সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও নিষ্ঠুর বর্ণবাদের প্রামাণ্য দলিল। বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডব খ্যাত কবি অমিয় চক্রবর্তী ১৯৩৬ সালে আফ্রিকাতে ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন ; সেখানে তিনি লিখেন, আফ্রিকা আজ অত্যাচারিত দেশের চরম বেদনা ভোগ করছে।

আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় বিচারে এশিয়ার পরেই আফ্রিকার অবস্থান। পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোকে গণনায় ধরে মহাদেশটির আয়তন ১১,৬৬৮,৫৯৮ বর্গমাইল। এই মহাদেশ বিশ্বের মোট ভূপৃষ্ঠতলের ৬ ভাগ এবং মোট স্থলপৃষ্ঠের ২০.৪ ভাগ জায়গা জুড়ে অবস্থিত। বর্তমানে এ মহাদেশের ৬১টি রাষ্ট্র কিংবা সমমানের প্রশাসনিক অঞ্চলে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করে। আফ্রিকার মধ্য বরাবর নিরক্ষরেখা চলে গেছে। মহাদেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর, উত্তর-পূর্বে সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগর, পূর্বে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। উত্তর-পূর্ব পাশে আফ্রিকা মহাদেশসিনাই উপদ্বীপের মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সাথে সংযুক্ত। আফ্রিকা একটি বিচিত্র মহাদেশ। এখানে রয়েছে নিবিড় সবুজ অরণ্য, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, জনমানবহীন মরুভূমি, সুউচ্চ পর্বত এবং খরস্রোতা নদী। এখানে বহু বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস, যারা শত শত ভাষায় কথা বলে। আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলের জীবন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই রয়ে গেছে, অন্যদিকে অনেক শহরে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

ফসিল রেকর্ডের হিসাবে আফ্রিকাতেই পাওয়া গিয়েছে মানবজাতির সবচেয়ে আদি বসতভূমির সন্ধান। ধীরে ধীরে মানবজাতি এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। খনিজ, বনজ কিংবা অন্য যেকোনো প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান পড়েছে আফ্রিকাতেই। বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার সূতিকাগার হচ্ছে মিশর যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। সুপ্রাচীনকাল থেকেই নীল নদ মিসরের জীবনযাত্রায় মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। নীল নদের অববাহিকায় উর্বর সমতল চাষযোগ্য ভূমি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের স্থায়ী কৃষি কাজ ও সেই সঙ্গে অর্থনীতির গোড়াপত্তনের পাশাপাশি একটি কেন্দ্রীভূত সমাজ গঠনে সাহায্য করে। যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।তারা দক্ষতা অর্জন করে কাপড় বোনা আর মাটির পাত্র তৈরিতে। এরপর হাতিয়ার তৈরিতে পাথরের বদলে শুরু করেছিলো বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার যেমন ব্রোঞ্জ, পরবর্তীতে তামা ও আরও মূল্যবান খনিজ দ্রব্য। প্রাচীন মিশরিয় হস্তলিপি অর্থাৎ হায়ারোগ্লিফিক মিশরিয় সভ্যতার আরেকটি মাইলফলক। খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার দু'শ সালের দিকে প্রাচীন মিশরিয়রা সাত শতাধিক চিহ্ন দিয়ে উদ্ভাবন করেছিলো ছবির মাধ্যমে লেখা বর্ণমালা বা হস্তলিপি। যা হায়ারোগ্লিফিক নামে পরিচিত। পৃথিবীর প্রাচীনতম এই বর্ণমালা যা আজও বিশ্বের এক বিস্ময়। নীলনদের তীরে জন্মানো একরকম নলখাগড়া দিয়ে তৈরি কাগজ প্যাপিরাস ছাড়াও মাটির পাত্র ও বিভিন্ন পাথরে খোদাই করে লেখা হতো এই হস্তলিপি। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে আমরা এখন জানতে পারি, আড়াই হাজার বছর আগেই আফ্রিকার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিশিষ্ট কয়েকটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে যে সভ্যতা বিকশিত হয়েছিলো তার বিস্ময়কর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যদিকে নাইজেরিয়ার উত্তরে পাওয়া গেছে লোক সংস্কৃতির নানা চিহ্ন। 'সাও'-দের যে সভ্যতা নবম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো তার অনেক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় ইওরুবাদের ধর্মীয় কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বেনিনে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত সভ্যতা বর্তমান ছিলো তারও কয়েক হাজার নমুনা উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হয়, পনেরো থেকে সতেরো শতক বেনিনের শিল্পরীতির পূর্ণবিকাশের যুগ, আঠারো উনিশ-শতকে শুরু হয় অবক্ষয়।

কঙ্গোর নিম্নভাগে সাম্প্রতিককালে অনেক পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া জাম্বেজি ও লিমপোপোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি পরিত্যক্ত শহরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। তবে একটি কথা মনে রাখা জরুরি, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নানা কারণে বহুকাল থেকে আফ্রিকা মহাদেশ অনেকগুলো স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলে বিভক্ত ছিলো। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার উত্থান পতন ঘটেছে কিন্তু পরস্পর একত্র হয়ে কোন একটি বিশিষ্ট সভ্যতা বা ব্যবস্থা সমগ্র মহাদেশে কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রাকৃতিক সম্পদে আফ্রিকা বিশ্বের অন্য যেকোনো মহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে। প্রাকৃতিক গ্যাস, তামা, কোবাল্ট, লোহা, বক্সাইট, খনিজ তেল তো বটেই, বিশ্বের সবচেয়ে দামি কিছু ধাতুর খনিও এ মহাদেশে রয়েছে। দামি ধাতুর মধ্যে সোনা, রুপা, হীরা, প্লাটিনামের খনিও এই মহাদেশে পাওয়া গিয়েছে। লাভের অঙ্ক বিবেচনায় আফ্রিকার সবচেয়ে বড় খনিজসম্পদ সোনা ও হীরা। সমগ্র আফ্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খনি অঞ্চলগুলো থেকে বছরে ৫০০ টন সোনা আহরণ করা সম্ভব। এছাড়াও সারা বিশ্বে যত হীরা আহরণ করা হয়, তার প্রায় সবটাই আসে আফ্রিকান দেশগুলো থেকে।

১৪ শতকের দিকে ইউরোপিয় পর্তুগিজ বণিকদের আগমনের মধ্যদিয়ে আফ্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর অধ্যায়ের সূচনা হয়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এই বণিকেরা আখের চাষাবাদ শুরু করেছিলো। স্থানীয় আফ্রিকানরা কাজ করতো আখের ক্ষেতগুলোতে। ধীরে ধীরে আফ্রিকার সরল মানুষগুলোর স্বাধীন পরিচিতি হারিয়ে যায়। দলে দলে বন্দী করে দাস হিসাবে ইউরোপে পাঠানো শুরু হয় তাদের। তৈরি হয় ঔপনিবেশিক শোষণ কাঠামো। উপনিবেশবাদ বলতে একটি দেশ কর্তৃক অন্য একটি দেশের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নেয়াকে বোঝায় , যা প্রায়ই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সাধারণত উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে অর্থনৈতিক আধিপত্য। উপনিবেশ শব্দটি এমন একটি শব্দ যা ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশের মধ্যে অসম সম্পর্ক এবং প্রায়ই ঔপনিবেশিক এবং আদিবাসীদের মধ্যে অসম সম্পর্ক বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।উপনিবেশ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Colony, ব্যুৎপত্তিগতভাবে Colony শব্দটি লাতিন কলোনিয়া থেকে এসেছে যার অর্থ 'কৃষিকাজের জায়গা'। কলিন্স ইংরেজি অভিধান উপনিবেশবাদকে 'দুর্বল মানুষ বা অঞ্চলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি শক্তির নীতি এবং অনুশীলন' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ওয়েবস্টার এনসাইক্লোপিডিক ডিকশনারি উপনিবেশবাদকে 'অন্য জাতির বা অঞ্চলগুলির উপর কর্তৃত্ব প্রসারিত বা বজায় রাখতে চায় এমন একটি দেশের সিস্টেম বা নীতি' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের ৯০ ভাগ ভূমি স্থানীয় আফ্রিকানদেরই দখলে ছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ইউরোপিয়সাম্রাজ্যবাদী দেশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, স্পেন, ইতালি ও পর্তুগাল আফ্রিকা মহাদেশের নানা অংশ দখল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তবে পরবর্তী বিশ বছরে এটি চরম সীমায় পৌঁছায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে এর সমাপ্তি ঘটে। আফ্রিকার জনগণ যদিও ইউরোপের এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো কিন্তু ইউরোপিয় দেশগুলোর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সামনে তারা টিকে থাকতে পারেনি। ১৯১২ সাল নাগাদ ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়া বাদে পুরো আফ্রিকা মহাদেশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ দখল করে নেয়। এর মাধ্যমে সমগ্র আফ্রিকা জুড়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে এসে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করে। অনেকগুলো রাষ্ট্র গত শতাব্দীর আট ও নয়ের দশকে এসে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অসভ্য বর্বর জাতি হিসেবে আফ্রিকাকে বিশ্বের কাছে অভিহিত করে তাদের উপর শাসন চালিয়ে যায় হিংস্র সাম্রাজ্যবাদীরা। এক্ষেত্রে তারা Blaming the victim প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন পরাশক্তি ইংরেজ, জার্মান, ফরাসি, স্পেনিশ কিংবা পর্তুগিজরা আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অংশ দখল করেছে। তাদের পরস্পরের ভাষা শুধু আলাদা নয়, তাদের ঔপনিবেশিক নীতি ও আচরণও পরস্পর স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র শোষণের একাগ্রতায় তারা ছিলো সমান্তরাল। ঔপনিবেশিক শক্তি নানা অজুহাতে স্থানীয় আদিবাসী আফ্রিকান নাগরিকদের উপর নির্মম অত্যাচার করতো। নির্যাতন প্রক্রিয়ায় তারা নানা রকম বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন করে।স্থানীয় আদিবাসী আফ্রিকার নাগরিকদের ওপর ঔপনিবেশিক ইউরোপের সাদা চামড়ার মানুষদের করা অত্যাচার ও বৈষম্যের নানা চিত্র আমরা লক্ষ করি।সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের উপনিবেশায়ন স্থায়ী করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য নানা মতবাদ প্রচার করতো।

> 'পশ্চিম' বলতে ধারণা দেওয়া হয়েছে শাদা চামড়ার খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী, যুক্তিবাদী, সভ্য, আধুনিক, যৌনক্রিয়াকাণ্ডে সুশৃঙ্খল এবং অবশ্যই 'পুরুষালি' মানুষ হিসেবে; অন্যদিকে উপনিবেশের অধীন 'অন্যদেরকে' ব্যাখা করা হয়েছে 'নেটিভ' হিসেবে, যারা কালো,

> আদিম, যুক্তিহীন, অসভ্য, প্রাগাধুনিক, যৌনতাড়িত, নিয়ম ভঙ্গকারী, পৌরুষহীন, দুর্বল, শিশুসুলভ। এর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে ইউরোপীয়রা অ-ইউরোপীয়দের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তারা শুধু প্রাচ্যকে শাসন করবার জন্যে যোগ্য নয়, তাদের দায়িত্বই হচ্ছে প্রাচ্যকে শাসন করা এবং 'সভ্য করা'। (রাত্তানসি, ১৯৯৭; ৪৮০)

১৯৯০ সালের তথ্য অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যা ছিলো ৩ কোটি ৮ লক্ষ। এর মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ছিলো ৫০ লক্ষ ১৮ হাজার। কিন্তু কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক শ্বেতাঙ্গরা ভোট দিতে পারতো। অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। ১৯১১ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের খনি সংক্রান্ত এক আইনে স্বর্ণখনির উচ্চ পদে কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়োগ প্রদান করা বাতিল করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯২২ ও ১৯৩৯ এর সিভিলাইজড লেবার পলিসি দ্বারা সকল উচ্চপদ শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। প্রিটোরিয়া সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা, নাবিবিয়া , জিম্বাবুয়ে, মোজাম্বিকসহ প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ এলাকা স্থাপন করেছিলো। এখানে শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের বসবাস নিশ্চিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ স্থানীয় আফ্রিকানকে বসত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। ১৯৩৬ সালের 'নেটিভ ল্যান্ড আইন' বলে দেশের ৭০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় মাত্র ১৩ শতাংশ ভূমি। পাস আইনের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা সমগ্র দেশের মধ্যে তাদের চলাচলের অধিকার হারায়। শুধু তাই নয়, ১৯৫৪ সালের পর থেকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে চলাচলের সময়ও পাস বা পরিচিতি বই না রাখলে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারতো। শ্রমিকদের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে সরকারি প্রশাসনের হাতে ছিলো, মূলত শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো এই কাজগুলো নির্ধারণ করে থাকতো। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ তার চাকরি ত্যাগ বা পরিবর্তন করতে পারতো না। চাকরি পরিবর্তনের জন্য তাদেরকে মালিকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে হতো, অন্যদিকে পুলিশ কৃষ্ণাঙ্গদেরকে প্রহার করে মালিকের কাছেই ফিরিয়ে দিতো। শ্রমিকদের উপর শ্বেতাঙ্গ মালিক শারীরিক নির্যাতন চালানোকালে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক যদি তাতে বাধা প্রদান করতো, তবে শ্বেতাঙ্গ মালিক তাকে প্রহার করার জন্য পুলিশের সাহায্য নিতে পারতো। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা শুধুমাত্র কাজের জন্য শ্বেতাঙ্গ এলাকায় যেতে পারতো, এছাড়া তাদের শ্বেতাঙ্গ এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিলো। একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিককে সাধারণত এক থেকে দেড় বছরের ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হতো। কোনো শ্রমিক যদি কোনো স্থানে টানা ১৫ বছর কাজ করতো তাহলে সে সেখানে তার পরিবারের সঙ্গে থাকার অনুমতি পেতো। কিন্তু নানা অজুহাতে তাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। কাজে বিলম্ব করলে অথবা অনুপস্থিত থাকলে গুরুতর শাস্তির বিধান ছিলো। কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে যদি কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বাদানুবাদে লিপ্ত হয়, সেটা কৃষ্ণাঙ্গের জন্য একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিলো। গ্রামাঞ্চলে কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীনভাবে চলাফেরা করলে তাকে জোরপূর্বক যে কোনো কারখানায় নিয়োগ করা হতো। কারখানাগুলোতে প্রতিদিন একজন শ্রমিককে গড়ে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হতো কিন্তু তারা যে পরিমাণ বেতন পেতো তা দিয়ে তাদের নিজেদের খাবার জোগানো ছিলো অসম্ভব। কোনো শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হতো কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে কোনরকম ক্ষতিপূরণ দেয়া হতো না। আবার মানবেতর জীবনযাপন করা এই সকল শ্রমিকদের অধিকাংশের নিজস্ব কোনো ঘরবাড়ি ছিলোনা। তারা সাধারণত মালিকের কারখানার বাইরে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতো। কোথাও কোথাও দরজা জানলা বিহীন কিছু টিনের ঘর তৈরি করা হয়েছিলো, ছোট ছোট ঘরগুলোতে গাদাগাদি করে ২০-২৫ জন শ্রমিক রাত্রিযাপন করতো।

বর্ণবাদ হলো জাতিবৈষম্য ও বর্ণ-পৃথকীকরণের সবচেয়ে সংহত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এ ব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ শোষিত, শাসিত,অত্যাচারিত ও পদদলিত হয়েছে বহু কালব্যাপী। অথচ শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী শাসকদের ধৃষ্টতার দৃষ্টান্তএই অমানবিক প্রথা দীর্ঘকাল ধরেই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিলো উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মানবাধিকারের ধ্বজাধারী দেশগুলোর চোখের সামনেই। অথচ ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়েছিলো জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে বর্ণবাদী ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা ছিলো নিজ দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। মানুষ হিসেবে প্রাপ্য তাদের বহু অধিকার শ্বেতাঙ্গ আইনে ছিলো অস্বীকৃত। নিজ মাতৃভূমিতে তাদের চলার অধিকার ছিলো সীমাবদ্ধ। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন প্রথম মানব সভ্যতার প্রাচীন ভূমি আফ্রিকায় প্রবেশ করলো তাদের হাতে ছিলো যিশুর বাণী বাইবেল, ক্রমশ তারা আফ্রিকার রাজদণ্ড হাতে তুলে নিলো। আর আফ্রিকাবাসীর হাতে তুলে দিলো বাইবেল। রাজদণ্ডের সঙ্গে নিলো সমগ্র ভূখণ্ড ; উপহার দিলো জীর্ণ আবাস, ভগ্ন-দেহ, আর কোনো মত বেঁচে থাকার জন্য কয়েকটি মুদ্রা। এক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মযাজক ডেসমন্ড টুটুর বক্তব্য পরিধাণযোগ্য। তিনি ঔপনিবেশিক শাসন ও ধর্মযাজকদের সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন-

> সাদা চামড়ার দেবতাতুল্য লোকগুলো যখন এলো, তখন তাদের হাতে ছিলো বাইবেল আর কালো মানুষদের অর্থাৎ আমাদের হাতে ছিলো মৃত্তিকা, জমি। ওরা বললো চোখ বন্ধ করো, ঈশ্বরকে ভাব, ধ্যানস্থ হও। আমরা বন্ধ করলাম আমাদের চোখ। তারপর চোখ খুলে দেখি ওদের হাতে আমাদের ভূমি, আর আমাদের হাতে শুধুই একখানা বাইবেল।(ডেসমন্ড টুটু, ২০০৪ ; ১৩-১৪)

সর্ব-আফ্রিকীয় চৌহদ্দি মহাদেশের সীমারেখায় আবদ্ধ থাকেনি। আগ্রাসী ইউরোপ একদিকে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে শোষণ করেছে, অন্যদিকে লাখ লাখ আফ্রিকাবাসীকে ক্রীতদাস বানিয়ে জাহাজে করে চালান দিয়েছে আমেরিকা কিংবা ওয়েস্ট-ইন্ডিজে। চামড়ার কালো রংয়ের জন্য তাদের সাধারণ আখ্যা হয় নিগ্রো। বিদেশাগত শাসক-শোষকেরা ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করতো এই মানুষগুলোকে। কালো চামড়ার মানুষদের উপর সাদা চামড়ার মানুষদের আধিপত্য ও অত্যাচার আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের সবচাইতে কুৎসিত ও কলঙ্কজনক ঘটনা।

> দাসপ্রথা, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবাদের উৎপত্তি একই শেকড় থেকে। যে শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ এবং অমানবিক মানসিকতা এই তিন কুপ্রথার সঙ্গে যুক্ত তার সবই সক্রিয় ছিলো আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান ও আমেরিকার ভূ-খণ্ডে। (খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, ২০০৪; ১৭২)

সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ংকর শাসনব্যবস্থা ও আফ্রিকার মানুষের আর্তির কথা বাংলা সাহিত্যের অনেক মহীরুহর লেখায়ও প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে প্রকাশিত হয় আফ্রিকার উপনিবেশায়ন, ভূ-রাজনীতি ও বর্ণবাদের নিষ্ঠুর প্রভাবের কথা। ৩রা অক্টোবর, ১৯৩৫ ফ্যাসিস্ট মুসালিনির নির্দেশে ইতালিয় আক্রমণকারী সৈন্যদল আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লিখেছেন

> উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
> স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
> নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
> তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
> রুদ্র সমুদ্রের বাহু
> প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
> ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
> বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
> কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
> নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
> তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
> পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুত মিশে;
> দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
> বীভৎস কাদার পিণ্ড
> চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।
> (আফ্রিকা, শান্তিনিকেতন, ২৮ মাঘ, ১৩৪৩)

আফ্রিকায় ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর অত্যাচার, তাদের ভূ-রাজনীতি, বর্ণবাদ, দাস প্রথা ও কালো মানুষদের মানবিক বিপর্যয়ের চরম পরাকাষ্ঠ প্রদর্শিত হয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার, আধিপত্যের স্বরূপ, ক্ষমতায়নের রূপ-বৈচিত্র্য ইত্যাদি ফুটে উঠেছে আফ্রিকার সাহিত্যে। বিশেষ করে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র ছোটগল্পগুলোতে প্রকাশিত হয় এই নির্মম বাস্তবতা। আফ্রিকা মহাদেশের পরিধি অনেক বড়, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, জীবন চালনার রীতি ও উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া ভিন্নতর হওয়ায় তাদের গল্প এবং গল্পের বিষয়বস্তুও বিভিন্ন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষের

উপর যে অত্যাচার হয়েছিলো সে বিষয়ে সবক্ষেত্রেই একটা সমান্তরাল তাৎপর্যময়তা প্রত্যক্ষ করা যায় কতিপয় গল্পের আলোচনার মাধ্যমে। বিচিত্র ছোটগল্পগুলো থেকে আমরা আফ্রিকা মহাদেশে হয়ে যাওয়া ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের ভূ-রাজনীতি ও বর্ণবাদের পরিচয় লাভ করতে পারি।

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রেক্ষাপটে তায়েব সালাহ (১৯২৯-২০০৯) রচনা করেন *'এক মুঠো খেজুর'* গল্পটি। এই গল্পটি উত্তম পুরুষের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কাহিনি ও চরিত্রায়ণে গল্পকার রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে গল্প বর্ণনাকারী উত্তম পুরুষের দাদা চরিত্রকে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে মাসুদ সাহেব শোষিত আফ্রিকার জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এই গল্পে এসেছেন। মাসুদ সাহেব স্থানীয় বাসিন্দা। আর কথকের দাদা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে এদেশে এসে উপস্থিত হন। পরবর্তীকালে কৌশলে মাসুদ সাহেবের মত অগণিত স্থানীয়দের জমি দখল করে নেয় সাম্রাজ্যবাদী রূপী কথকের দাদারা।গল্পে দাদা কথককে বলেন-

> আমি যখন এই গ্রামে প্রথম, তখন আমার এক ফেদান জমিও ছিলোনা। তখন এসবের মালিক ছিলো মাসুদ। আজ চিত্রটা উল্টো। আর আমার মনে হয় ওপারের সমন পৌঁছানোর আগে মাসুদের বাকি জমিটুকুও আমারই হবে। (তায়েব সালেহ, ২০০২; ৩২৬)

মাসুদ রূপী স্থানীয়দের জমিতে উৎপাদিত ফসল সাম্রাজ্যবাদী কথকের দাদা কেটে নিয়ে যাচ্ছে অথচ তাদের আটকাবার অধিকার নেই। এই গল্পে বর্ণিত উপনিবেশায়নের চিত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের উপনিবেশায়নের সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা জানি, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে সংবিধান ঘোষণা করেন সেখানে বলা হয় জমিদারকে তার রাজস্ব নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে কোম্পানির কাছে জমা দিতে হবে। এ আইনকে মূলত সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) বলা হতো। কোনো জমিদার কোম্পানির পাওনা রাজস্ব সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তার জমিদারি ক্রোক করা হতো। আর এই আইনের ফলে বহু জমিদার তাদের জমিদারি হারায়। আইন চালু হবার প্রথম দশ বছরের মধ্যে বাংলায় কেবলমাত্র বর্ধমান জমিদারি ছাড়া অন্য সব জমিদারি ধ্বংস হয়ে যায়। আফ্রিকানদের মতো ভারতে সূর্যাস্ত আইন জারি করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা পুরাতন জমিদারদের জমি নিলামে তুলতো। যেমনটি হয়েছে মাসুদ সাহেবের সাথে। তাদের কষ্টের কথা ধ্বনিত হয় মাসুদ সাহেবের চিৎকারের মতো। *দেখিস বাবা, খেজুরের কলজে কেটে ফেলিস না। (তায়েব সালেহ, ২০০২; ৩২৭)*

সেমবেন উসমান (১৯২৩-২০০৭) রচিত *'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোল্‌তেইকরা'* গল্পে গল্পকথক ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চাচ্ছে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় এই গল্পে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ উপজাতিরা প্রতিনিয়ত ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শোষণের শিকার হয়েছে। তারা সব সময় চেয়েছে এই শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে। গল্পের শুরুতে দেখতে পাই উপজাতি মানুষের দেহের ক্ষত চিহ্নের কাহিনি বর্ণনা করা হচ্ছে। আফ্রিকা থেকে জাহাজে করে দাস ব্যবসায়ীরা তাদেরকে নিয়ে বিদেশে বিক্রি করতো। জোরপূর্বক মানুষ ধরে নিয়ে দাসে পরিণত করা এই দাস ব্যবসায়ীদের হাতে বন্দী হয় আমুর মেয়ে ইওমে। এক পর্যায়ে আমু তাদের সাথে যুদ্ধ করে তার মেয়েকে বাঁচায়। মোমুতু নিজে কৃষ্ণাঙ্গ হলেও সে ছিলো মূলত দালাল প্রকৃতির দাস ব্যবসায়ী। সে আমুকে জানায়, সে তার মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবে এই শর্তে যে- পরবর্তীতে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যদি সংঘর্ষ হয় সে যেন তাকে সাহায্য করে। আমরা দেখতে পাই, আমু তার মেয়েকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং পালিয়ে গিয়ে তার শাশুড়ির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনেকদিন পরে এই মোমুতু তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে আবারো সেই এলাকায় আক্রমণ করে। একটা সময় আমু বুঝতে পারে তার মেয়েকে আর সে রক্ষা করতে পারবে না। তখন সে তার মেয়ের পিঠে নিজেই কিছু ক্ষত চিহ্ন এঁকে দেয়, মেয়ে রক্তাক্ত হয়। সে জানতো তার রক্তাক্ত মেয়েকে এরা দাসে পরিণত করবে না। ইতোপূর্বে তার স্ত্রী যাতে করে দাসে পরিণত না হয় সেজন্য সে নিজেই তাকে হত্যা করেছিলো। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, আফ্রিকার এই কালো মানুষেরা দাস হতে চায়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানুষেরা আমুর শাশুড়ির কাছে এসেছে তাদের এই ক্ষত চিহ্নের গল্প শোনার জন্য। অন্যদিকে আমু তার পরিবারকে রক্ষার্থে নিজে সেই দাস ব্যবসায়ীদের কাছে ধরা দিয়েছিলো। সেই থেকে মাথা নত না করা উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত হয় তাদের শরীরের এই ক্ষত চিহ্ন।

> খবরটা ক্রোশের পর ক্রোশ ছড়িয়ে গেল। দূর-দূর গ্রাম থেকে লোক এল দিদিমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। আর বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহে নানারকম ক্ষতচিহ্ন দেখা দিতে লাগল। আর এভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের শরীর ক্ষত করে দাগী করে দেয়া হলো। তারা কিছুতেই গোলাম হতে চায়নি। (সেমবেন উসমান, ২০০৪;৩১৭)

ফার্দিনান্দ ওইওনো (১৯২৯-২০১০) তার '*পদক*' গল্পে ঔপনিবেশিক শাসনের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। পদক গল্পটি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও বর্ণবাদের এক প্রামাণ্য দলিল। স্থানীয়দের খুশি রাখার জন্য, দমিয়ে রাখার জন্য নামমাত্র তাদেরকে পদকের লোভ দেখিয়ে অনেকটা আফিম খাওয়ানোর মতো বুদ করে রাখা হতো। যেমনটি করা হয়েছিলো আমাদের দেশে। ইংরেজ কর্তৃক নানা উপাধি পেয়ে আমাদের স্থানীয়রা উপনিবেশায়নের প্রেমে বুদ হয়ে ছিলো বহুকাল। আপাত দৃষ্টিতে স্থানীয়দের খুশি করার চেষ্টা করলেও তার মধ্যেও বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্ট করে নজরে আসে। এই গল্পের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে বর্ণবাদ ও উপনিবেশায়নের নিষ্ঠুর চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন স্থানীয় আফ্রিকানদের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও সাংস্কৃতিক সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। আমরা দেখি এই গল্পে মেকা শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে পদক নিতে এসেছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে। সে একজন কৃষ্ণাঙ্গ। এই গল্পের লেখক কালো ও সাদার মধ্যে এক ধরনের ভিন্নতাকে তুলে ধরেছেন। সাদা মানুষের কাছে কীভাবে কালো মানুষ নিগৃহীত হয় তা লেখক এখানে উপস্থাপন করেছেন। মেকা যেখানে পদক আনতে গিয়েছে সেখানে সাদা মানুষের আনাগোনা। সেখানে গিয়ে তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করছিলো। আর তখন সে নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করে ভাবে-*আমি কাঁদিনি। জীবনে কখনোই কাঁদিনি আমি। পুরুষ মানুষ, হ্যাঁ সত্যিকারের পুরুষ মানুষ কখনো কাঁদে না... (ফার্দিনান্দ ওইওনো, ২০০২; ৩১৮)*

গল্পে দেখতে পাই মিস্টার ফউকানি অস্থিরভাবে দেশীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দিকে যান। বড়লাট আসছেন না। এমন সময় বড়লাট আসেন, তিনি এসে একজন গ্রিক শ্বেতাঙ্গের কাঁধে কাঁধ ধরে গালে গাল ঠেকালেন। তারপর তাকে মেডেল তুলে দিলেন, এরপর মেকাকেও মেডেল দিলেন । কিন্তু মেকার মেডেল ও সেই শ্বেতাঙ্গের মেডেলের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। এখানেই ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম চিত্র লুকায়িত। লেখক সাদা কালোর মধ্যে পার্থক্য দেখানোর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নির্মম ইতিহাস আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।এই গল্পের শেষে বর্ণবাদ, বৈষম্য ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব আমরা লক্ষ করি। এই গল্পের শেষে কিছু অংশ অনুবাদ করা হয়নি, কিন্তু মূল গল্পে আছে যে, মেকার পদক গ্রহণ শেষে মেকাসহ বাকি কৃষ্ণাঙ্গরা বাড়ি ফেরার সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে এবং সবাই একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু নির্মম পাশ আইনের ভিত্তিতে কৃষ্ণাঙ্গদের গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীতে অনেকক্ষণ হাজতে থাকার পর মেকা মুক্তি পায়। তাই হয়তো আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের নেতা কেনেথ কাউন্ডা দুঃখ করে বলেছিলেন, শাসকরা তাদের একজন গর্দভ শ্বেতাঙ্গকেও একজন কালো আফ্রিকান দার্শনিকের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করে।

ইভোন্নি ভেরা (১৯৬৪-২০০৫) '*অন্য পশু কেন খোদাই করোনা?*' গল্পের মধ্যে রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণবাদের ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। উঁচু গাছের পাতা খাওয়া নিয়ে জিরাফ ও হাতির মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব। মূলত এই গল্পের মূল লক্ষ্য হলো রাজনীতি এবং বর্ণবাদ। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে। প্রতিটি বর্গের নিজস্ব ক্ষমতা আছে কিন্তু ক্ষমতাকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখার বিষয়। অর্থাৎ রূপকের আড়ালে হাতি ও জিরাফের মাধ্যমে বর্ণবাদের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। গল্পকার লিখেছেন

> হাতি দীর্ঘকাল ধরে বন শাসন করছে। সে বনের চেয়েও প্রবীণ। কিন্তু জিরাফ গাছের উপর দিয়ে তার গলা লম্বা করে সদর্পে চলাচল করে, যেন সে-ই বনের মালিক। (ইভোন্নি ভেরা, ২০০২; ৩৩১)

অন্যদিকে গল্পকার আবার লিখছেন-

> জিরাফ গর্বিত ও রাজকীয় ভঙ্গিতে হাটে, এর কারণ হচ্ছে তার সুন্দর চিত্রিত চামড়া, যা সে তার পিঠে বহন করে। (ইভোন্নি ভেরা, ২০০২; ৩৩২)

এতে করে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপনিবেশের বিরুদ্ধে শুধু কৃষ্ণাঙ্গরা নয় বরং শ্বেতাঙ্গরাও কলম ধরেছিলেন,তার অন্যতম উদাহরণ নোবেল বিজয়ী নাডিন গার্ডিমার (১৯২৩-২০১৪)। তাঁর রচিত '*ছ'ফুট জমিন*' গল্পে উঠে এসেছে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গদের স্বেচ্ছাচারিতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনি। এ গল্প উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী ও তার স্ত্রী শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে জায়গা কিনে বিশাল খামার বাড়ি গড়ে তুলেছিলো। দেখাশোনার জন্য ছিলো অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ, যারা পরিবারসহ ফার্মের ভিতর বসবাস করতো। সে সময় কৃষ্ণাঙ্গদের এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যেতে হলে অনুমতির দরকার হতো। রোডেশিয়া থেকে কৃষ্ণাঙ্গ পেট্রুসের ভাই পারমিট ছাড়া পায়ে হেঁটে এখানে এসেছিলো এবং নিউমেনিয়া আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বিষয়টি জানার পর শ্বেতাঙ্গ মালিক চিন্তিত হয়ে ওঠেন। পেট্রুসের ভাইয়ের লাশ হসপিটাল থেকে সরাসরি দাফন করে দেয়া হয় কিন্তু এদিকে পেট্রুস তার ভাইয়ের লাশ পাবার আশায় খরচ বাবদ তার সঞ্চয়ের সমস্ত টাকা শ্বেতাঙ্গ মালিকের কাছে তুলে দেয়। মৃত ভাইয়ের জন্য অর্থ খরচ শ্বেতাঙ্গ মালিকের কাছে এক রকম বিলাসিতা বলে মনে হয়। এদিকে রোডেশিয়া থেকে পেট্রুসের বাবা তার ভাইয়ের শেষকৃত্য করার জন্য আসেন। সরকারি কর্মকর্তারা তার ভাইয়ের লাশ বলে যে লাশটি তাদেরকে দেয় সেটা তার ভাইয়ের লাশ ছিলোনা। পরবর্তীতে পেট্রুস তার ভাইয়ের লাশ ও প্রদানকরা অতিরিক্ত অর্থ ফেরত পায়না। আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষদের বর্ণবাদী আচরণ এবং স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারের পরিচয় আমরা এ গল্প থেকে পাই।এই গল্পের শেষে অনেকটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে শ্বেতাঙ্গদের চোখে কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণবৈষম্যের জন্য এইসব কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ হিসেবে কোনো মর্যাদা নেই। বর্ণবৈষম্য কবলিত এইসব মানুষ মৃত্যুর পরেও বৈষম্যের শিকার। তাদেরকে পরিচয়হীন বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

> রোডেসিয়ার বৃদ্ধ লোকটি অনেকটা লেরিসের বাবার আয়তনের। সে তাই তার বাবার একটি পুরানো স্যুট তাকে দিয়ে দিল। এর ফলে বৃদ্ধ লোকটি যেভাবে এসেছিলো তার চেয়ে ভালো ভাবে ফিরে গেল - বিশেষ করে শীতকালের পক্ষে। (নাডিন গার্ডিমার, ২০০২; ৩৪৬)

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো (১৯৩৮-) রচিত '*ক্রুশ সকাশে বিবাহ*' গল্পে ফ্ল্যাশব্যাকে অতীতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর চিন্তার বহিরঙ্গে বি-উপনিবেশায়নের ছাপ ছিলো তাঁর প্রমাণ এই গল্প। পারিবারিক কাহিনির সঙ্গে সমান্তরালে ও অবিচ্ছিন্নভাবে ইতিহাস, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিষয়টি এসেছে। চলচ্চিত্রের 'মুনতাজ' ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন গল্পকার। চলচ্চিত্রের ভঙ্গি ব্যবহার করা আফ্রিকার গল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আফ্রিকাতে রিজার্ভ অঞ্চল তৈরির করার নামে বনজঙ্গল কেটে ফেলা হতো ; সে প্রসঙ্গটিও এই গল্পে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া এই গল্পে বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ, কলোনির হয়ে যুদ্ধ করা, কেনিয়ার স্বাধীনতা প্রসঙ্গগুলো সমান্তরালভাবে এসেছে। প্রথমদিকের ওয়ারিউকি ছিলো সাধারণ আফ্রিকার মানুষের প্রতিনিধি। গল্পের প্রধানচরিত্র ওয়ারিউকির বিবর্তনের মধ্যে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিষয়টি যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বাস্তবতাও তুলে ধরেছেন গল্পকার। তৎকালীন সময়ে মানবিক অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে ও সংস্কৃতির বিকাশে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিলো তাতে ওয়ারিউকি যোগদান করে। এর ফলে অবশ্য তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু সে পিছপা হয়নি। প্রথম পর্যায়ে, ওয়ারিউকির চরিত্র উপস্থাপন করতে লেখক শ্বেতাঙ্গদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিদ্বেষ ও বিদ্রুপের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

> সাহেব-বসদের নকল করা, তাদের কথা বলার, হাঁটবার ভঙ্গি নিয়ে বিদ্রূপ করা, তাদের নানা ধরনের মুদ্রাদোষের অনুকরণ, কালা আদমিদের প্রতি তাদের ব্যবহার-সব সে নকল করে দেখাত। (নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০০২; ৩০৪)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ওয়ারিউকির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। স্বাধীন দেশে সে যেন আরো বেশি প্রভাবিত হয় ঔপনিবেশিক আধিপত্য দ্বারা। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেলেও তাদের অমানবিক মনোভাব রেখে গিয়েছিলো কিছু কিছু কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে। ওয়ারিউকিও সেই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাম বদলে নিজের নাম রাখে লিভিংস্টোন। তার চরিত্রের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। গরীব কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যদের ঘৃণার চোখে দেখা এর মধ্যে অন্যতম। গল্পকার লিখছেন-

> ওরা ওকে ভালোবাসতো, কিন্তু ওর স্বামীকে পছন্দ করত না। লিভিংস্টোন ওদের কুঁড়ের দল বলে অবজ্ঞা করত। আমার মতো জান দিয়ে খাটতে পারে না কেন ওরা? কেন মালিকের বউ শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে যায়? (নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০০২; ৩১২)

গল্পে ওয়ারিউকি পুনরায় মিরিয়ামুকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে মিরিয়ামু রাজি হয়। কারণ সে শুধু ফিরে পেতে চেয়েছিলো তার আগের ওয়ারিউকিকে। কিন্তু লিভিংস্টোন কোনো শ্রমিককে বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়নি। লিভিংস্টোনের অহংকার ছোট করার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী সত্তা জেগে উঠলো মিরিয়ামুর মধ্যে। সে লিভিংস্টোনকে বিয়ে করতে অসম্মতি জানায়।

> ওড়না সরিয়ে সকলের দিকে সোজা চেয়ে সে বললো, না আমি পারবো না। লিভিংস্টোন কে আমি বিয়ে করতে পারিনা। কারণ... কারণ... আমার বিয়ে হয়ে গেছে আগেই ওয়ারিউকির সঙ্গে। সে মরে গেছে। (নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০০২, ৩১৬)

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে পরিবর্তিত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতিভূ লিভিংস্টোন নাম ধারণ করা ওয়ারিউকি। অন্যদিকে প্রান্তিক মানুষের প্রতিভূ মিরিয়ামু; যে তার নিজ দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষকে ভালোবাসে।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ায় আমরা আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আফ্রিকায় সাধারণ মানুষের উপরে শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপক বিপুল প্রভাবের কারণে এই মানুষগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। উপনিবেশের কালোছায়া তাদেরকেও গ্রাস করেছিলো। অনেক কৃষ্ণাঙ্গ তাদের চিন্তা-চেতনায় ইউরোপকে গ্রহণ করেছে এবং ইউরোপের ধ্যান-ধারণাকে তারা নিজেদের মধ্যে লালন করে। একে এক ধরনের আধিপত্যবাদ বলা যেতে পারে, যার মাধ্যমে স্থানীয় আফ্রিকার কালো মানুষেরা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে ইউরোপের ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে।আধিপত্যবাদ থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় বৌদ্ধিক (intellectual) প্রতিরোধ।

> ক্ষমতার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে দু'ভাবে - 'আধিপত্য' স্থাপন এবং 'বৌদ্ধিক ও নৈতিক নেতৃত্বে'র মাধ্যমে। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে আবার ঐ বৌদ্ধিক-নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেই জয়ী হতে হবে। (গ্রামশি, ১৯৭১; ৫৭)

বৌদ্ধিক প্রতিরোধের অন্যতম উপায় নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা। জাতিসত্তার আত্মপ্রকাশ ও সংস্কৃতির প্রসারে ভাষা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকার অধিকাংশ সাহিত্যিক ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষাকে ব্যবহার করায় আফ্রিকার নিজস্ব ভাষা অবহেলিত বলে অভিযোগ করেছিলেন সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো। তিনি নিজেও সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে, তবে পরবর্তীতে নিজের ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মনোভাবের জন্য বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত চিনুয়া আচেবে (১৯৩০-২০১৩) ঔপনিবেশিক ও নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যা কিছু বলেছেন তা বিদেশি ভাষা ব্যবহার করেই বলেছেন। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার কারণ হিসাবে বলেন, ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে আফ্রিকান সাহিত্য এবং সমাজকে সহজেই সারা বিশ্বের কাছে হাজির করা যায়। কারণ ভাষাটি সমগ্র বিশ্বের যোগাযোগের মাধ্যম। আর তাই বলা যায়, আফ্রিকান সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মর্মধ্বনি আলোড়িত হয়, প্রতিধ্বনিত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস। সুপ্রাচীন কাল থেকেই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলে আসছে। আধুনিককালে এসে আমরা দেখি যারা নিজেদেরকে সভ্যতা ও মানবতার প্রধান ঝান্ডাধারী হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রচার করে ও প্রমাণ করতে চায়, তাদের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বহু পুরনো কৃষ্টি এবং সভ্যতা। নিজেদের প্রযুক্তির ব্যবহার করে তারা মানুষের উপর চালিয়েছে অত্যাচারের স্টিমরোলার। আমরা দেখি ইউরোপের বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলো সারাবিশ্বে তাদের উপনিবেশ তৈরি করেছিলো। এই সকল উপনিবেশগুলোতে তারা প্রথমে বাণিজ্য কিংবা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলো কিন্তু কালক্রমে তারা স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভূমি ও ক্ষমতা দখল করে নেয়। তাদের ক্ষমতার দাপটে স্থানীয় জনগণ সংখ্যাগুরু হবার পরেও বারংবার অত্যাচারের শিকার হয়। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করালগ্রাসে সমগ্র বিশ্ব নিগৃহীত এবং লাঞ্চিত হয়েছে বিগত কয়েক শতক ধরে। কিন্তু সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের মানুষেরা। প্রকৃতিগতভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত আফ্রিকা মহাদেশকে বারবার

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দখল করে নেবার জন্য নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদের কারণে ইউরোপের পরাশক্তিগুলো আফ্রিকাকে ছেড়ে যায়নি এবং তারা আফ্রিকার সাধারণ মানুষের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতিকে কেড়ে নেবার জন্য তাদের উপর ইউরোপের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিয়েছে। আফ্রিকার মানুষেরা নিজেদের ভূমির অধিকার হারিয়েছে। শুধুমাত্র কালো রঙের মানুষ হবার কারণে এই লোকেদের সাথে করা হয়েছে বর্ণবাদী আচরণ, মানুষগুলোকে পরিণত করেছে দাসে। আফ্রিকার অতীত, বর্তমান, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন ইউরোপিয় ও স্থানীয় ভাষায় অনেক সাহিত্যকর্ম লিখিত হয়েছে। এসকল সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে একাধারে প্রকাশ পায় যেমন আফ্রিকার অতীত ইতিহাস-সভ্যতা, ঠিক একইভাবে প্রকাশ পায় সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশতন্ত্রের করালগ্রাসে নিমজ্জিত আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার মর্মবাণী। বিশেষকরে আফ্রিকার ছোটগল্পগুলোতে বর্ণবাদ কিংবা ভূ-রাজনীতির বিষয়গুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। আমাদের মনে রাখা জরুরি আফ্রিকা মহাদেশ একটি বৃহৎ ভূখণ্ড। এ কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা এবং সংস্কৃতি বিচিত্র। ঠিক তেমনি তাদের গল্পের উপকরণ এবং জীবনবোধের মধ্যেও নানা রকম বৈচিত্র্য বিদ্যমান। তবে এইসকল বিচিত্র গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে গল্পকারেরা গ্রহণ করেছেন ইউরোপিয়দের আগমনের ফলে আফ্রিকা মহাদেশে তাদের ভূ-রাজনীতি এবং ইউরোপ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান জনগণের বর্ণভেদ প্রথার শিকার হওয়ার কলঙ্কময় ইতিবৃত্তকে।আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। তারা দাসে পরিণত হতে চায়নি। এ সকল ঘটনা পরিশ্রুত হয় আফ্রিকার ছোটগল্পগুলোতে। ইতিহাসের পাতায় সর্বদা সত্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়না। কারণ ইতিহাস মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে। কিন্তু মানুষের লেখা সাহিত্যকর্ম যুগে যুগে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আফ্রিকার ছোটগল্পগুলো যেন এক একটি ঐতিহাসিক দলিল। আফ্রিকার মানুষের প্রকৃত জীবন বাস্তবতা, তাদের অত্যাচারিত হবার কথা, তাদের বর্ণবাদের শিকার হবার বর্ণনা, তাদের ভূমির অধিকার হারানোর যন্ত্রণা এবং একইসাথে তাদের আত্মমর্যাদা ও প্রতিরোধের ইতিহাস বিবৃত হয় ছোটগল্পগুলোতে। আফ্রিকার ছোটগল্পগুলোর মাধ্যমে আমরা আফ্রিকা সম্পর্কে এক নতুন ধারণা লাভ করতে পারি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আফ্রিকার যে বর্ণনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে এবং কালক্রমে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা প্রচারিত যে ডোমিনেটিং ডিসকোর্সের মধ্যদিয়ে আমরা আফ্রিকাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, তা বর্জনের ক্ষমতা আমরা লাভ করতে পারি। আফ্রিকা মহাদেশের একটি নতুন ভাবমূর্তি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। খোলা চোখে আমরা আবিষ্কার করি এক নতুন আফ্রিকাকে, যা কখনোই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. শিবনারায়ণ রায় (২০০২), আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়), ঢাকা-১২১৫: কাগজ প্রকাশন।
২. ডেসমন্ড টুটু (২০০৪), আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ-২ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়, শামীম রেজা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯: কাগজ প্রকাশন।
৩. খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (২০০৪), উপনিবেশবাদ: আফ্রিকান-ক্যারিবিয়ান এবং আফ্রিকান আমেরিকান প্রেক্ষিত, আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ-২ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়, শামীম রেজা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯: কাগজ প্রকাশন।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১), আফ্রিকা, সঞ্চয়িতা, ঢাকা: মৌ প্রকাশনী।
৫. তায়েব সালেহ (২০০২), এক মুঠো খেজুর, আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়), ঢাকা-১২১৫: কাগজ প্রকাশন।
৬. সেমবেন উসমান (২০০৪), উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা, আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ-২ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়, শামীম রেজা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯: কাগজ প্রকাশন।
৭. ফার্দিনান্দ ওইওনো (২০০২), পদক, আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়), ঢাকা-১২১৫: কাগজ প্রকাশন।
৮. ইভোন্নি ভেরা (২০০২), অন্য পশু কেন খোদাই করো না? আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়), ঢাকা-১২১৫: কাগজ প্রকাশন।
৯. নাডিন গার্ডিমার (২০০২), ছ' ফুট জমিন, আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়), ঢাকা-১২১৫: কাগজ প্রকাশন।

১০. নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো (২০০২), ক্রুশ সকাশে বিবাহ, আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ (সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়), ঢাকা-১২১৫: কাগজ প্রকাশন।
11. Gramsci, A. (1971), Selections from the Prison Notebooks (translated by Q. Hoare and G. Nowell Smith), New York: International Publishers.
12. Rettansi, A. (1997), 'Postcolonialism and its discontents', Economy and Society, Volume 26 Number 4, London: Routledge.